Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-IX, Issue-IV, July 2021, Page No.86-98
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

বঙ্কিম উপন্যাসে অনালোকিত মাতৃত্ব

Baishakhi Banerjee
M. Phil, Research Scholar, Dept. of Bengali, Burdwan University

Abstract:
Bankimchandra was the first successful novelist in Bengali literature. When he started writing novels, no clear structure of the novel was created in Bengali literature. In front of him there was some design, suh as kaliprasanna singh's ' Hutum penchar noksha' , pyarichand Mitra' s 'Alaler ghore dulal' etc. He became famous for writing novels such as social, historical romance. Yet the mother character in his novel had been neglected. There is not much to say about mother in any novel. In some stories the mother of the heroine is dead and some where the mother is sick. My discussion is about this unnoticed being of the maternal character.

সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪) বাংলা গদ্যসাহিত্যের গতিকে নতুন ধারায় বইয়ে বাঙালি জন মানসের গল্প শোনার আকাঙ্ক্ষাকে পরিতৃপ্ত করেছিলেন। উনিশ শতাব্দীতে ইতিহাসের মিশ্রণে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সাহিত্যে রোমান্সের প্রচলন করেন। গল্প রসের পাঠক তাতে তৃপ্ত হলো কিন্ত জীবন রসের সন্ধানী যারা তাদের আকাঙ্ক্ষা মিটলোনা। তথাপি বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গের সর্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক। তিনি কবি,দার্শনিক, সাহিত্য সমালোচক, প্রাবন্ধিক ও জাতীয়তার উদ্গাতা। এরকম বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী একজন ব্যক্তিত্বকে নিয়ে আলোচনা সমালোচনা ও অনেক হয়েছে। বঙ্কিম জীবনী ও আমরা পাই যেখান থেকে ব্যক্তি বঙ্কিমকে জানা যায়, যা স্রষ্টা বঙ্কিমকে বুঝতে সাহায্য করে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্কিম সাহিত্যের নানা দিক নিয়ে গবেষণা হয়েছে , যেমন 'বঙ্কিম সাহিত্যে স্বদেশচিন্তা' , ' বঙ্কিম উপন্যাসে নরনারী সম্পর্ক', 'বঙ্কিম উপন্যাসে নারীচেতনাবাদী অধ্যায়ন' প্রভৃতি। আমার আলোচনা র অভিমুখ অন্যদিকে। বঙ্কিম উপন্যাসে নানান কাহিনি ও চরিত্রের ভিতর যে চরিত্রটির ওপর একটুও আলো পড়েনি, সেটা হল মাতৃ চরিত্র। উপন্যাসের মূল কাহিনি ও মূল চরিত্রের সঙ্গে প্রায় কোন উপন্যাসেই মা চরিত্রের কোন যোগ নেই। সৃষ্টির আদিতে মা। একদিন এদেশের গৃহ ও সমাজ মায়ের নিয়ন্ত্রনেই গড়ে উঠেছিল। কালক্রমে পুরুষপ্রধান আর্য সমাজের প্রভাব পড়েছে। ফলে বাইরের কর্মাঙ্গনে পুরুষ সক্রিয় হয়ে উঠেছে। মায়ের স্থান নির্দিষ্ট হয়েছে অন্তঃপুরে, গৃহকর্মাদি সম্পন্ন করা, সন্তান প্রতিপালনে মায়ের কোন বিকল্প হয়না। এই মা চরিত্র নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র প্রায় নীরব। অনেক দুঃসাহসী নারী চরিত্র পেয়েছি বঙ্কিম উপন্যাসে, পেয়েছি নির্মলকুমারী, চঞ্চলকুমারীকে, প্রফুল্ল শৈবলিনীকে। রক্ত মাংসের এই মানবী মা ভীষণ উপেক্ষিতা বঙ্কিম উপন্যাসে। ঐতিহাসিক রোমান্সের যে আখ্যান তিনি নির্মান করেছিলেন সেখানে ঘরোয়া জীবনের

বর্ননা করার পরিসর খুব ই কম, কিন্তু সামাজিক উপন্যাসে ও এই মাতৃ চরিত্রের বিশেষ স্থান নেই, কোথাও নামমাত্র উল্লেখ কোথাও বা কাহিনির শুরুতেই মায়ের মৃত্যু ঘটে গেছে, বেশ কিছু ক্ষেত্রে কাহিনির নায়িকারা মাতৃহারা। বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের উদ্ভব মূলত উনিশ শতকের প্রথম দিকে। তার পূর্বে ছড়া, পাঁচালী, ব্রত কথা, রূপকথা, মঙ্গলকাব্য, পদাবলি সাহিত্যে স্নেহময়ী মাতৃ রূপের পরিচয় পাওয়া যায়। উনিশ শতকে বঙ্কিমচন্দ্র যখন উপন্যাস সাহিত্যে আবির্ভূত হলেন তিনি পেলেন মধুসূদনের উত্তরাধিকার। বীরাঙ্গনা নারী চরিত্রর মাঝেও কেকয়ীর মাতৃ হৃদয় স্পষ্ট হয়েছে পাঠকের কাছে, ' মেঘনাদ বধ' এর মতো মহাকাব্যিক আখ্যানেও চিত্রাঙ্গদা, মন্দোদরীর মতো শোকাকুল মা রা আছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫) বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম সার্থক উপন্যাস। ঐতিহাসিক, রোমান্সধর্মী, রোমান্টিক সামাজিক, পারিবারিক,মনস্তাত্ত্বিক ইত্যাদি বিষয় অবলম্বনে উপন্যাস রচনা করেছেন। উপন্যাস গুলিকে নিম্নোলিখিত ভাগে ভাগ করা যায়।

১) রোমান্সধর্মী উপন্যাস - দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫), কপালকুন্ডলা (১৮৬৬), মৃণালিনী (১৮৬৯),যুগলাঙ্গুরীয় (১৮৭৪), চন্দ্রশেখর (১৮৭৫),

২) দেশাত্মবোধমূলক উপন্যাস – আনন্দমঠ (১৮৮৪), দেবীচৌধুরানী (১৮৮৫)

৩) পারিবারিক ও সামাজিক উপন্যাস – বিষবৃক্ষ (১৮৭৩), রজনী (১৮৭৭), কৃষ্ণকান্তের উইল (১৮৭৮),

৪) ঐতিহাসিক উপন্যাস - রাজসিংহ (১৮৮২), সীতারাম (১৮৮৭)

সুকুমার সেন বাঙ্গালা সাহিত্যে ইতিহাসে র তৃতীয় খণ্ডে বলেছেন "রাজসিংহ ছাড়া বঙ্কিমের আর সব উপন্যাসের আখ্যানবস্তু বাঙ্গালাদেশের চৌহদ্দিতে পরিকল্পিত। কিন্তু তাহার মধ্যে শুধু দুইটিতে , বিষবৃক্ষে ও কৃষ্ণকান্তের – উইলে প্রায় সমসাময়িক বাঙ্গালীর কথা স্থান পাইয়াছে।"[১] বাংলাতে পরিকল্পিত কাহিনি হয়ে ও মায়ের কথা সেখানে স্থান পায়নি, বিষবৃক্ষ ও কৃষ্ণকান্তের উইলে ও সেই অভাব মেটেনি। মা ডাক বড়ই মধুর। বৃথা জীবন তার, যার ঘরে মা নেই। মাতৃস্নেহ থেকে যে বঞ্চিত সে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ থেকেই বঞ্চিত।

তিনি যে সব নারী চরিত্র এঁকেছেন, তারা প্রেম সর্বস্ব নারী চরিত্র। স্নেহময়ী জননীর সেখানে কোন স্থান নেই।পরবর্তী অধ্যায় গুলিতে আলোচনা করে দেখে নেবো বঙ্কিম উপন্যাসে মাতৃ চরিত্রর যে অপ্রতুলতা পেলাম তা প্রথম পর্বের বাংলা সাহিত্যে ছিল কি না ?

প্রাক্ আধুনিক বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে মা চরিত্র

বাংলার ব্রত কথা রূপকথাতে দেখা যায় মায়ের দীনদুঃখীনি মূর্তি। বাংলার ব্রত দুপ্রকার, এক কুমারী ব্রত অন্যটি বধূ ব্রত। বধূ ব্রতে মাতৃত্বের কামনা স্পষ্ট। শুধু সন্তান কামনা করলেই হয়না, সন্তান যেন বেঁচে থাকে তার জন্য ও ব্রতে মা রা কামনা করে "হয়ে পুত্র মরবে না ।/পৃথিবীতে ধরবেনা ।।" ছেলেভুলানো ছড়ায় যে মায়ের কথা আছে সে মায়ের লক্ষ্য সন্তানের মনস্তুষ্টি। তার (মায়ের) স্তব স্তুতি দেবতার উদ্দেশ্যে নয়, প্রত্যক্ষ নবজাতকের উদ্দেশ্যে। ব্রতকথায় মায়েদের লক্ষ্য দেবতার সন্তুষ্টি। ছড়ায় শিশুকে ভোলানোর অনেক প্রচেষ্টা। প্রতিটি ছড়ায় মাতৃস্নেহের প্রকাশ। সন্তানের সামান্য কষ্টে মা ব্যাকুল। মেয়ে পদ্মদিঘীতে জল আনতে গেছে। সূর্য পাটে বসল , আকাশ জুড়ে মেঘ করে এল। মায়ের ভয় যদি খুকুর গোছাভরা চুল ভিজে যায়।তাই মা নিষেধ করে -

' বিষ্টি এলে ভিজবে সোনা
চুল শুখানো ভার।

জল আনতে খুকুমণি
যায়না যেন আর।।'[২]
আবার মায়ের কখনো চিন্তা-
' চাঁদ মুখেতে রোদ লেগেছে
রক্ত ফেটে পড়ে।'[৩]

ছড়া , ব্রত কথা এগুলো মেয়েলি রীতি । মেয়েদের মধ্যেই এগুলো প্রচলিত । এগুলো মুখে মুখে প্রচলিত লিখিত সাহিত্যিক উপাদান হিসাবে এগুলোর গ্রহনযোগ্যতা ততটা নয়। এছাড়া ও পদাবলি সাহিত্যে (বৈষ্ণব, শাক্ত) মঙ্গল কাব্যে ও আমাদের আলোচ্য মাতৃ চরিত্ররা রয়েছে, যারা সন্তানকে লালন করেছে, সন্তানের জন্য ভয় পেয়েছে আবার সন্তানের সুখে স্বস্তি পেয়েছে। একটা প্রচলিত কথা আছে , কুপুত্র যদিও হয় কুমাতা কখনো নয়। বঙ্কিম উপন্যাসে কুমাতা কি সুমাতা এটা নির্নয় করার অবকাশ ই পাঠক পাননি কারণ মাতৃ চরিত্র সৃষ্টির অপ্রতুলতা।

বৈষ্ণব সাহিত্যে আমরা মা যশোদাকে পাই। বালক কৃষ্ণকে কেন্দ্র করে যশোদার বাৎসল্যের চিত্র আঁকা হয়েছে। বাঙালি মায়ের মনে সর্বদা যেমন আতঙ্ক, দুশ্চিন্তা ও উৎকণ্ঠা থাকে তার সন্তানকে নিয়ে গোষ্ঠলীলার পদে তেমনি মা যশোদার বিরহ ব্যাকুলতা ফুটে উঠেছে। কৃষ্ণকে গোষ্ঠে যেতে হবে শুনে মা যশোদা র মন নানা শংকার কথা ভেবে ব্যাকুল হয়েছে। স্বপ্ন দেখে তিনি কেঁদে বলেন

" কুস্বপ্ন দেখেছি আজ নিশীথে।
যাইতে দিব না গোপাল গোষ্ঠেতে।। "[৪]
তবু ছেলেকে ছাড়তে হয়েছে আর বারবার বলেছেন –
" বলাই ধাইবে আগে   আর শিশু বাম ভাগে
শ্রীদাম সুদাম সব পাছে ।
তুমি তার মাঝে যাইও   সঙ্গ ছাড়া না হইও
মাঠে বড়ো রিপু ভয় আছে ।।"[৫]

শাক্ত গীতেও মা মেনকা স্নেহ সোহাগে প্রতিটি বাঙালীর হৃদয়ে আজ ও বিদ্যমান। বিবাহিতা কন্যা উমা বৎসরান্তে শরৎ কালে মাত্র তিনদিনের জন্য মায়ের কাছে আসে। মায়েদের কামনা মেয়ে পতিগৃহে সুখি হোক। কিন্তু মায়েদের সে আশা প্রতি পদে ভঙ্গ হয়। রাত্রে দুঃস্বপ্ন দেখেন মেনকা –

"বাছার নাই সে বরণ, নাই আভরণ
হেমাঙ্গী হয়েছে কালীর বরণ
হেরে তার আকার চিনে উঠা ভার
সে উমা আমার, উমা নাই হে আর"[৬]

শাক্তগীতির মা মেনকা গৃহিনীপনার প্রতিমূর্তি। তিনি জানেন, পুরুষের লোক লৌকিকতা জ্ঞান অল্প তাই স্বামীকে স্মরণ করিয়ে দেন,

' গিরিরাজ হে, জামায়ে এনো মেয়ের সঙ্গে।'
শচীমাতা বঙ্গজননীর আর এক ভাবের মূর্তি , গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস গ্রহণ করবে শুনেই তিনি
' মূর্ছিতা হইয়া ক্ষনে পড়ে পৃথিবীতে।'[৭]

জ্ঞান ফিরে এলে তিনি হাহাকার করে বলেন

' না যাইয় না যাইয় বাপ্।'

মঙ্গলকাব্যের দেবদেবী নির্ভর কাহিনীর আড়ালেও মানবী মাহয়ের মাতৃত্বর চিত্র ফুটে উঠেছে। মঙ্গলকাব্যের মা সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে উঠে এসেছে, ব্যাধিনী, ডোমনী, কৃষানী,রাজরানী,বনিকপত্নী প্রভৃতি। মনসামঙ্গল কাব্যে সনকা বাংলা সাহিত্যের দুঃখিনী মা । ছয় পুত্রকে হারিয়ে শিরে করাঘাত করে বলে যে এমন পোড়া কপাল কার, যার একদিনে ছয় ছেলে হারায়। পুত্রহীনার জীবনে কি সাধ? ঘরে আগুন দিয়ে যোগিনী হব, বিষ খেয়ে প্রাণত্যাগ করব। এই কাব্যের আর এক দুঃখিনী চরিত্র বেহুলার মা সুমিত্রা। বেহুলার সঙ্গে যখন লখাইর বিয়ের প্রস্তাব এল, তখন মা বেঁকে বসলেন –

"সুমিত্রা বলেন বিভা না দিব তথাই।
বিভারাতে সর্পাঘাতে মরিবে লখাই।।"[৮]

চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে ব্যাধ কালকেতুর মা নিদয়া পুত্রের বিবাহে উলুধ্বনি দিয়েছে, যা বাঙালী লোকাচারের কথা মনে করিয়ে দেয়। পুত্র পুত্রবধূর সুখের সংসার দেখে নিদয়া তৃপ্তমনে কাশীযাত্রা করেছেন স্বামীর সঙ্গে। আর এক মা খুল্লনা, শ্রীমন্তকে কেন্দ্র করে তার স্নেহ বাৎসল্য র প্রকাশ ঘটেছে। শ্রীমন্তর সিংহল যাত্রার কথায় খুল্লনার মাতৃহৃদয় কেঁপে উঠেছে। উপরোক্ত বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা দেখলাম যে লৌকিক মানবিক কিংবা দৈবী যেকোন আখ্যানে ই স্বমহিমায় মায়ের উপস্থিতি। আমরা যদি রামায়ন , মহাভারতের দিকে তাকাই সেখানেও অনেক এরকম দৃষ্টান্ত পাবো। সুমিত্রা, কৌশ্যলা, কৈকেয়ী, মন্দোদরী ও চিত্রাঙ্গদার মতো মা আছে রামায়নের গুরুগম্ভীর মহাকাব্যিক আখ্যানে। কোমল স্নেহশীল মায়েদের কথা সেখানেও আছে। মা এর মহিমা যেন সর্বব্যাপী। বাংলার প্রকৃতি যেন আমাদের মানবী মায়ের ই এক রূপ। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'মা বলিতে প্রাণ করে আনচান চোখে আসে জল ভরে।' (দুইবিঘাজমি/ চিত্রা কাব্য)

বঙ্কিম সমকালে নকশা জাতীয় উপন্যাস সাহিত্যে মা প্রথম বাংলা উপন্যাস কোনটি, এই নিয়ে মতভেদ আছে। 'মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস' এর স্রষ্টা আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে বাংলা উপন্যাসের সূচনা ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ' নববাবু বিলাস' থেকে। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে প্যারীচাঁদ মিত্রের ' আলালের ঘরে দুলাল' 'ফার্স্ট নভেল ইন দি বেঙ্গলি লিটারেচার'। শিবনাথ শাস্ত্রী ' আলালের ঘরে দুলালের পাশাপাশি কাঙাল হরিনাথ মজুমদারের 'বিজয় বসন্ত' কে প্রথম উপন্যাসের মর্যাদা দিয়েছেন। সেই তর্ক বিতর্কের শেষ নেই, আমার আলোচনা বঙ্কিম পূর্ব নকশায় কিভাবে মাতৃচরিত্র কে দেখানো হয়েছে ? কোন গুরুত্ব আছে কি নেই ? কাঙাল হরিনাথ মজুমদারের 'বিজয় বসন্ত' (১৮৫৯) তে জয়পুরের রাজা জয়সেন, তার স্ত্রীর মৃত্যুর পর পুনর্বিবাহ করেন এবং দ্বিতীয়া স্ত্রীর পরামর্শে দুই পুত্র বিজয়চন্দ্র ও বসন্তকুমারকে কারারুদ্ধ করা হয় , ত্যাজ্যপুত্র ঘোষণা করে তাদের দেশ থেকে বিতাড়িত করা হয়। অন্যদিকে বিজয়পুরের রাজা রমণীমোহন যুদ্ধে নিহত হন , তাঁর পত্নী সুশীলা একমাত্র কন্যাসন্তান পাঁচ বছরের বিমলাকে প্রতিপালন করেন। এছাড়া প্রধানন্ত্রীকে সামনে রেখে তিনি নিজেই সমস্ত রাজকার্য চালান। এই সুশীলা একজন মহিয়সী নারী, রাজমহিষী হয়ে ও তার কোন অহঙ্কার ছিলনা। সংসারের সব কাজ নিজে হাতে সামলাতেন, পরিচারিকাদের খাওয়াতেন, পালিত পশুদের ও রোপিত বৃক্ষলতার তত্ত্বাবধান করতেন। যুদ্ধক্ষেত্রে বলেছিলেন যে সংসারে ও যত দুঃখ আছে পরাধীনতার দুঃখ সকল হইতে দুঃসহ আর স্বাধীনতা সকল সুখ থেকে শ্রেষ্ঠ। এখানে সুশীলা মা , সে সন্তান কে একাই সামলেছে। সুশীলা একটা গুরুত্বপূর্ন চরিত্র আখ্যান কে গতিময় করতে তার ভূমিকা অনস্বীকার্য।

উনিশ শতকে বাঙালি সমাজে ও ভদ্রলোক সম্প্রদায়ের স্ববিরোধ এবং ভন্ড লোকাচারকে ব্যঙ্গ ও বিদ্রুপ করে বহু প্রহসন ও নকশা লেখা হয়েছিল। নকশা বলতে বোঝায় এমন রচনা যা হবে বিদ্রুপাত্মক এবং সমাজের ই কোন অংশের সমালোচনামূলক রচনা। একাধিক গ্রন্থের লেখক প্যারীচাঁদ মিত্র র (১৮১৪-১৮৮৩) 'আলালের ঘরে দুলাল' (১৮৫৮, দ্বি – স ১৮৭০) বাংলা সাহিত্যে প্রথম উপন্যাস নামে পরিচিত। কলকাতার সমকালীন সমাজ এর প্রধান বিষয়বস্তু। বৈদ্যবাটির বাবুরাম বাবু , তার বিপুল বৈষয়িকতার মধ্যে তিনি ভুলে যান তার একমাত্র পুত্রকে নৈতিকতার শিক্ষা দিতে। পিতার এমন আদর ও ঔদাসীন্যে পুত্র মতিলাল বখে যায়। মা, বোন তাকে ত্যাগ করে। শেষে বরদাবাবুর স্নেহ ছায়ায় এসে মতিলালের চৈতন্যোদয় হয় । কাশী গিয়ে মা বোনের সাথে মিলন হয়। এই কাহিনির মধ্যে ও মায়ের কথা পাই স্বল্প অবকাশে । আমাদের পরিচিত চেনা মাতৃ মূর্তিতে। মতিলালের বখে যাওয়া তার মায়ের দুশ্চিন্তার
কারণ হয়েছে। আলালের ঘরে দুলালের ৬ নম্বর অধ্যায়ের নামকরণ ই এরকম ' মতিলালের মাতার চিন্তা,ভগিনীদ্বয়ের কথোপকথন,বেণী ও বেচারামবাবুর নীতি বিষয়ে কথোপকথন ও বরদাপ্রসাদবাবুর চিন্তা' এরপর ২১ নম্বর অধ্যায়ে র শিরোনাম 'মতিলালের গদিপ্রাপ্তি ও বাবুয়ানা, মাতার প্রতি কুব্যবহার- মাতা ভগিনীর বাটি হইতে গমন ও ভ্রাতাকে বাটিতে আসিতে বারণ ও তাহার অন্য দেশে গমন' । মতিলালের সঙ্গে তার মায়ের কথোপকথনের কিছুটা অংশ নিম্নে উল্লেখিত হল,

'বাবা! আমার কপালে যাহা ছিল তাহা হইয়াছে ,এক্ষণ যে কদিন বাঁচি সে কদিন যেন তোমার কুকথা না শুনতে হয় - লোকগঞ্জনায় আমি কান পাতিতে পারিনা , তোমার ছোট ভাইটির , বড়ো বোনটির ও বিমাতার একটু তত্ত্ব নিও-.....................বাবা! আমি নিজের জন্য কিছু বলিনা, তোমাকে ভার ও দিইনা।'[৯]

মতিলাল একথা শুনে দুই চক্ষু লাল করে বলল যে কি বকছো তুমি জাননা আমি নিজে যা মনে করি সেভাবেই চলি এই বলে মাকে এক চড় মেরে ঠেলে ফেলে দিল। এরপর ' জননী উঠিয়া অঞ্চল দিয়া চক্ষের জল পুঁছিতে পুঁছিতে বলিলেন - বাবা! আমি কখন শুনি নাই যে সন্তানে মাকে মারে, কিন্তু আমার কপাল হইতে তাহা ও ঘটিল- আমার আর কিছুক কথা নাই কেবল এইমাত্র বলি যে তুমি ভাল থাকো। মাতা পর দিবস আপন কন্যাকে লইয়া কাহাকেও কিছু না বলিয়া বাটী হইতে গমন করিলেন ।'[১০]
এখানে মায়ের সেই চিরন্তন শাশ্বত ত্যাগী স্নেহময়ী মাকে ই আমরা দেখলাম। সন্তান আঘাত করার পর মা যিনি হন তিনি ই পারেন প্রত্যাঘাত না করে সন্তানের ভালো থাকার কামনা করতে। আখ্যানের শেষে মাতা পুত্রের মিলন হয়েছে।

এরপর যে রচনাটির কথা আসে সেটি কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০-১৮৭০) র ' হুতোম প্যাঁচার নকশা ' (প্রথম খণ্ড ১৮৬২ সালে আর প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্রে ১৮৬৫ সালে প্রকাশিত হয়) । 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' য় আছে ঊনবিংশ শতাব্দীর কলকাতার এক নগ্ন ছবি। কলকাতার সামাজিক, অর্থনৈতিক ,সাংস্কৃতিক চিত্র ও অসঙ্গতি গুলো খুব সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে এই নকশায়। অনেক টুকরো টুকরো ঘটনার চিত্র আছে, কাহিনীর সুচারু বয়ান এখানে নেই। শহুরে হুজুগ আর ভণ্ডামি কে তুলে ধরা হয়েছে। তবু ও টুকরো টুকরো ভাবে মায়ের যে ছবি তুলে ধরা হয়েছে তা খানিকটা এরকম, হঠাৎ অবতার নকশায় পদ্মলোচনের বড় ছেলের বিয়েতে, ' ...... বরযাত্র ও বরের আত্মীয় কুটুম্বরা জুটতে লাগলেন, বৈকালে পুনরায় সেই রকম মহাসমারোহে বর কনেকে বাড়ি নিয়ে যাওয়া হলো, বরের মা বর কনেকে বরণ করে ঘরে নিলেন ' – এখানে স্ত্রী আচারের সঙ্গে মায়ের গুরুত্বকে স্বীকার করা হয়েছে। আবার অন্য আর একটি দৃষ্টান্তে দেখি

মাহেশের স্নানযাত্রা র নকশায় গুরুদাস গুঁই এর বাড়িতে তার বুড়ো মা, বালিকা স্ত্রী ও বিধবা পিসি থাকতো। গুরুদাসের বাড়িতে ইয়ার দোস্তরা এলে গুরুদাসের মা তাদের আপ্যায়নের জন্য চকমকী, শোলা,টিকে ও তামাকের মেটে বাক্স এনে দেয়। গুরুদাসের খিদে পেলে মাকে খাবার দিতে বললে ‘ ঘরে অ্যামন তইরি খাবার কিছুই ছিলনা, কেবল পান্তা ভাত, আর তেঁতুল দিয়ে মাছ ছিল, তাঁর মা তাই চারখানি ম্যেটে খোরায় বেড়ে দিলেন, গুরুদাস ও তাঁর ইয়াররা তাই বহুমান করে খেলেন।’

ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের উল্লেখযোগ্য নকশা ‘আপনার মুখ আপুনি দেখ’ (১৮৬৩)। চন্নন বিলাসী বাবু বলেছেন মা, বোন যদি পর হয় তা হোলে পরকালে আর আপনার কে হবে? মাতা দশমাস দশদিন গর্ভে স্থান প্রদান কোরে অসহ্য প্রসব বেদনা সোয়ে বিশ্বকারুর এই সুচারু সৃষ্টি দেখালেন, মেগের বশ হয়ে যদি জননীর ভরণ পোষণে অসক্ত হওয়া হয়, তাহা হইলে পরকালে গতি কি হবে? আর ও বলেছেন ‘ মা কি কম কষ্ট সোয়ে মানুষ করেছেন ? খাবার জিনিস পেয়ে এক দিবসের জন্য মুখে দ্যান নি । মা যে কত স্নেহ করেন , তা ছেলের ছেলে হোলে তখন বিবেচনা কোল্লে জানতে পারে, কিন্তু এখনকার মানুষ সে বিবেচনা করেনা । আমরা আমাদিগের পুত্র কন্যাদির প্রতি যেরূপ স্নেহ করিতেছি, মাতা ও তো আমাদিগের প্রতি সেইরূপ স্নেহ করিয়াছেন এবং এ পর্যন্ত তাকে কষ্ট দিলেও তার স্নেহের লাঘব হয়না ; তার সে স্নেহ সমভাব ই থাকে।‘[১১] বাস্তবিকই তাই মায়ের স্নেহের কোন ভিন্নভেদ হয়না। সন্তান শত অপরাধ করলেও মায়ের কাছে সে প্রশ্রয় পায়, মায়ের কাছে সে পরম প্রিয়। নিজের সুখ সুবিধার কথা না ভেবে মা তার সন্তানকে সবটুকু দিয়ে বড়ো করে। আর সেই মাকে বাদ দিয়ে সমাজ ,সাহিত্য কিছুই হয়না।

বঙ্কিম উপন্যাসে অনালোকিত মাতৃত্ব

বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন এক বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। ইংরেজি রোমান্টিক সাহিত্য, বিশেষ করে ওয়াল্টার স্কটের রোমান্টিক উপন্যাসসমূহ , ধ্রুপদি সংস্কৃত সাহিত্য এবং জয়দেব - ভারতচন্দ্র ধারার বঙ্গদেশের সাহিত্য, এই তিন ধারা এসে মিশেছিল বঙ্কিমের রচনায়। উপন্যাসের জগতে বঙ্কিমচন্দ্র যে দুটি ক্ষেত্রকে বেছে নিয়েছিলেন তার একটি হল ইতিহাস অন্যটি সমকালীন সমাজ। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রায় সব উন্যাসেই নায়ক চরিত্র গুলি যেমন ব্যক্তিত্বহীন ,ভীরু দু একটা ক্ষেত্র ছাড়া তেমনি আর একটি চরিত্রকে ও নিষ্ক্রিয়, গুরুত্বহীন করে নির্মান করা হয়েছে সেটি আমাদের সকলের চেনা মা চরিত্র। বঙ্কিম উপন্যাসের পাঠক মাত্রেই জানেন যে তাঁর সাহিত্যে মা চরিত্র উল্লেখযোগ্য কোন আদর্শ স্থাপন করতে ব্যর্থ। ঐতিহাসিক কাহিনী নির্ভর আখ্যানগুলি বাদ দিলেও সামাজিক সমস্যা নিয়ে যে কাহিনীর বয়ান নির্মিত হয়েছে সেখানেও বিশেষ একটি চরিত্রকে পাশে রেখে কাহিনী এগিয়েছে, প্রধান চরিত্ররা তার কোন পরামর্শ , সাহায্য ছাড়াই পরিণতির পথ খুঁজে নিয়েছে। ১৮৬৫ তে ‘দুর্গেশনন্দিনী’ তে যিনি বাংলা উপন্যাসের সূচনা করলেন আর ১৮৮৭ তে সীতারাম লিখে যিনি শেষ করছেন , তিনি কেন কোন উল্লেখযোগ্য মা চরিত্র সৃষ্টি করেননি? এটা কি আখ্যানের বয়ানের জন্য না স্রষ্টার ব্যক্তিজীবনের কোন প্রভাবের জন্য? নিম্নে বঙ্কিম উপন্যাস গুলি আলোচনার মধ্য দিয়ে দেখে নেব উপেক্ষিতা মাতৃচরিত্রের স্বরূপ।

‘দুর্গেশনন্দিনী’ সাহিত্য সম্রাট রচিত প্রথম উপন্যাস। এই উপন্যাস প্রকাশিত হওয়ার পর বাংলা কথাসাহিত্যের ধারায় এক নতুন যুগ প্রবর্তিত হয়। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে উড়িষ্যার অধিকারকে কেন্দ্র করে মোঘল ও পাঠানের সংঘর্ষের পটভূমিতে এই উপন্যাস রচিত। একদিকে রয়েছেন যুদ্ধ ও ঘটনার ঘাত প্রতিঘাত, অন্যদিকে প্রেমের সূচনা , বিকাশ ও পরিণতি । রয়েছে মানসিংহ, জগৎসিংহ,কতুল খাঁ, উসমানের মতো ঐতিহাসিক চরিত্র । কিন্তু এই রোমান্সের প্রধান আকর্ষণ বিমলা- আয়েষা- তিলোত্তমা এই তিনটি নারী

চরিত্র। বিমলার, তিলোত্তমার জন্ম বিবরণ প্রসঙ্গে যে মায়ের চিত্র ফুটে উঠেছে, বলা যেতে পারে তা কলঙ্কের । বিমলা শুদ্র কন্যা আর তিলোত্তমা জারজা কন্যা। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে বিমলার পত্র থেকে পাঠক জানতে পারে

‘ দুঃখিনী মাতা আমাকে লইয়া এক কুটীরে রহিলেন। কায়িক পরিশ্রম দ্বারা জীবন ধারণ করিতেন ; কেহ দুঃখিনীর প্রতি ফিরিয়া চাহিত না। ’ [১২] তারপর কাহিনীর অগ্রগতির সঙ্গে মায়ের কোন যোগ নেই। পিতার সন্ধান পাওয়া গেছে, শশীশেখর ভট্টাচার্য অভিরাম স্বামী নামে কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ও বিমলার পাশে তাকেই দেখা গেছে। তিলোত্তমার মা মৃত, বিমলা তার দেখভালের কাজে নিযুক্ত ছিল। সেভাবে মাতৃত্বের প্রকাশক কোন ঘটনার উল্লেখ পাইনা। কথোপকথন কালে জগৎসিংহের কাছে বিমলার তার সখী বলেছে তিলোত্তমাকে। আখ্যান থেকে জানতে পারি শশীশেখর এর দুবার পদস্খলনের পর ও সে গুরুত্ব পেলো কিন্তু বিমলা ও তিলেত্তমা র মা যারা অন্ধকারে কলঙ্কের মধ্যে ডুবে গেল। শেষ পর্যন্ত তারা কোথাও সম্মান শ্রদ্ধা পেলনা, যা একজন মায়ের অধিকার। পাঠক কেবল এটুকু জানলো যে তারা পাতকী, আর পাপের পঙ্কেই ডুবে গেল। তাদের উত্তরনের কোন সম্ভবনা ঔপন্যাসিক তৈরি করেননি

‘ দুর্গেশনন্দিনী’ র একবছর পর প্রকাশিত হয় ‘কপালকুন্ডলা’ । কপালকুন্ডলা নামক নারীর কাহিনীই এ উপন্যাসের প্রধান সম্পদ। কপালকুন্ডলা নির্জন দ্বীপে কাপালিক কর্তৃক পালিতা। এক প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়ে নবকুমার এক জনবিচ্ছিন্ন দ্বীপে আটকে পড়ে। কাপালিক তাকে বলি দিতে উদ্যত হয়, কপালকুন্ডলা তাকে সাহায্য করে। নবকুমার কপালকুণ্ডলার বিয়ে হয় মন্দিরের অধিকারীর সহায়তায়। কপালকুন্ডলার মায়ের কোন উল্লেখ নেই কাহিনিতে। নবকুমার যখন বিয়ে করে স্বদেশে ফিরে আসে তখন দ্বিতীয় অধ্যায়ের ‘স্বদেশে’ নামক পঞ্চম পরিচ্ছেদে পাই ‘ কপালকুন্ডলাকে নিয়ে দেশে ফিরে এসেছে নবকুমার বাবা বেঁচে নেই ওর। বাড়িতে কেবল বিধবা মা আর দুই বোন। বড় বোন ও বিধবা। ছোটজন শ্যামাসুন্দরী সধবা হয়ে ও বিধবা, কারণ সে কুলীনের স্ত্রী ’ [১৩]এরপর আর মায়ের কোন উল্লেখ নেই, নবকুমারের ছোট বোন শ্যামাসুন্দরীর সঙ্গে কপালকুণ্ডলার কিছু কথাবার্তায় বৌদি ও ননদের মধ্যে যেমন সম্পর্ক হয় তার ই আভাস পাওয়া যায়। মায়ের নববধূর সঙ্গে কোন কথা নেই। ছেলে এতদিন পরে দেশে ফিরলো যেখানে গ্রামের সকলে রটিয়ে দিয়েছিল যে নবকুমারকে বাঘে খেয়েছে সে আর বেঁচে নেই । ঔপন্যাসিক সেখানে মায়ের জন্য কোন জায়গা রাখেননি। শ্যামাসুন্দরী কপালকুণ্ডলার মাথায় একগোছা অবিন্যস্ত চুল দেখে বলেছে ,

‘একবার আমাদের গৃহস্থের মেয়ের মতো সাজো। কতদিন যোগিনী থাকবে?’[১৪]

যেখানে ঘর গৃহস্থের কথা হয়, সেখান তো মায়ের কথা ও থাকতে পারে। কিন্তু মায়ের হারানো পুত্র ফিরে পাওয়ার যে অনুভূতি, একটা আবেগপ্রবন মূহুর্ত তৈরি হতে পারতো পাঠককে তা থেকে বঞ্চিত করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র

‘মৃণালিনী’ র উপজীব্য বিষয় তেরো শতকে মুসলমান বাহিনীর বঙ্গদেশে বিজয় কাহিনি। বক্তিয়ার খিলজির নবদ্বীপ অধিকার এই আখ্যানের উপজীব্য। এই ঐতিহাসিক ঘটনার প্রেক্ষাপটে দুটি প্রেমকাহিনি মুখ্য হয়েছে। এক হেমচন্দ্র – মৃণালিনীর অন্যটি পশুপতি- মনোরমার। মৃণালিনী ও মনোরমা দুজনে ই প্রায় অনাথ। হেমচন্দ্রের গুরু মাধবাচার্য মৃণালিনীকে গৌড়নগরে তার এক শিষ্যের বাড়ী রাখেন, কারণ তার আপন কেউ নেই। মনোরমার পিতার কথা আছে। মেয়ে জামাতার অনুমৃতা হবে জ্যোতিষ গণনায় এই কথা

শুনে মেয়েকে (মনোরমাকে) হারাবার ভয়ে খুব দুঃখিত হয়ে তিনি যা করেছিলেন তা নিম্নে উল্লেখ করা হল,

'তিনি ধর্ম নাশের ভয়ে মেয়েকে পাত্রস্থ করিলেন , কিন্তু বিধিলিপি খন্ডাইবার ভরসায় বিবাহের রাত্রেই মেয়ে লইয়া প্রয়াগে পলায়ন করিলেন............কিছুকাল পরে প্রয়াগে কেশবের মৃত্যু হইল। তাঁহার মেয়ে পূর্বেই মাতৃহীনা হইয়াছিল এখন মৃত্যুকালে কেশব হৈমবতীকে আচার্যের হাতে সমর্পণ করিয়া গেলেন। '[১৫] আগের উপন্যাস দুটির মতো এখানেও মাতৃ চরিত্র উপেক্ষিতাই থেকে গেছে। পিতারা স্থান পাচ্ছে, কিন্তু মাতারা নামমাত্র উচ্চারনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। পরবর্তী 'যুগলাঙ্গুরীয়' নামক উপন্যাসেও এরকম জ্যোতিষ প্রসঙ্গ আছে, বর বধূ র বিয়ে হয় চোখ ঢেকে। তারা কেউ কাউকে চিনবেনা কেবল আংটি ই একমাত্র চিহ্ন যা দেখে পরে তারা দুজন দুজনকে চিনবে। এখানেও সেরকম ই ঘটনা ঘটেছে প্রায়। যাই হোক মায়ের কোন ভূমিকা নেই এখানেও।

বঙ্কিম গবেষক অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য লিখেছেন, " বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম তিনটি উপন্যাস রোমান্সধর্মি ; এবং সেখানে সৌন্দর্যসৃষ্টিই তাঁর ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু বিষবৃক্ষ তাঁর রচিত প্রথম সামাজিক উপন্যাস। এই উপন্যাসে শুধুসৌন্দর্যসৃষ্টি নয়; সেই সঙ্গে দেশ ও মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গল সাধনের ইচ্ছা ও যে তাঁর ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের শেষ ছত্রে (বঙ্গদর্শন ১২৭৯ ফাল্গুন) তাই তাঁর মন্তব্য , ' আমরা বিষবৃক্ষ সমাপ্ত করিলাম । ভরসা করি, ইহাতে গৃহে গৃহে অমৃত ফলিবে । ' বঙ্গদর্শনের এই ছত্রে 'বিষবৃক্ষ' ও 'অমৃত' শব্দ দুটি বড় হরফে ছাপা হয়েছিল।'' 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে বাল্যবিধবা নারীর প্রেম ও বিয়েকে সামাজিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়ার একটা সাহিত্যিক প্রয়াস আছে। নগেন্দ্র- সূর্যমুখী- কুন্দনন্দিনী এই তিনজনকে কেন্দ্র করেই মূল কাহিনী আবর্তিত হয়েছে। পাশাপাশি এসেছে হীরা- দেবেন্দ্র- হরিদাসী বৈষ্ণবী (ছদ্মবেশী দেবেন্দ্র দত্ত) – কমলমণি-তারাচরণ প্রভৃতি কিছু প্রয়োজনীয় চরিত্র। এখানে ও মায়ের চরিত্র নিয়ে ঔপন্যাসিক আলাদা কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করলেন না। কুন্দনন্দিনীর বাবা ই ছিল একমাত্র সহায়, সেই বাবার মৃতদেহ র পাশে বসে থাকতে থাকতে কুন্দ একটা স্বপ্ন দেখে । সেই স্বপ্নে অপূর্ব জ্যোতিঃবেষ্টিত যে নারী মূর্তিকে দেখতে পায় ,তাকে মা বলে মনে হয় তার। উপন্যাসের ' তৃতীয় পরিছেদ 'ছায়া পূর্বগামিনী'

সেখানেই স্বপ্নের কথা আছে আর কুন্দ র মনে হয়েছিল 'সেই করুণাময়ী তাহার বহুকাল মৃতা প্রসূতির অবয়ব ধারণ করিয়াছে। ' [১৬]সেই মূর্তি কুন্দকে জানায় যে সে (কুন্দ) অনেক দুঃখ পেয়েছে এবং আরো দুঃখ সে পাবে। কুন্দর বালিকা বয়স, এত দুঃখ সে সইতে পারবেনা। পৃথিবী ছেড়ে কুন্দকে চলে আসার আহ্বান জানায়। দুজন মনুষ্যমূর্তিকে দেখিয়ে তাদের থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দেন, এদের থেকে কুন্দনন্দিনীর সর্বনাশ হবে, আর ও বলেন যে তিনি আর একবার আবির্ভাব হবেন যখন কুন্দ 'মনঃপীড়ায় ধূল্যবলুণ্ঠিতা হইয়া, আমাকে মনে করিয়া, আমার কাছে আসিবার জন্য কাঁদিবে, তখন আমি আবার দেখা দিব, তখন আমার সঙ্গে আসিও।'[১৭] ঔপন্যাসিক কাহিনির পরিণতি র সূত্র পাঠককে এখানে ধরিয়ে দেন । কুন্দনন্দিনীর জীবনে যে ঝড় উঠবে সেটা এই স্বপ্নের ঘটনাই থেকেই বোঝা যায়। এটা তো মানবী মা নয়, স্বপ্নে আবির্ভূতা হয়ে স্বপ্নেই মিলিয়ে গেছিলেন। এই ঘটনা নিঃসন্দেহে উপন্যাসের জন্য খুব ই গুরুত্বপূর্ন , কিন্তু এই উপদেশ কোন মানুষের পক্ষে দান করা সম্ভব নয়। কমলমণি ও শ্রীশচন্দ্রের ছেলে সতীশের প্রসঙ্গ সামান্য আছে। মাতৃত্বের তেমন আকুলতা সেখানে প্রকাশ পায়নি, কমলমণি বেশী জড়িয়ে পড়েছে নগেন্দ্র- কুন্দ-সূর্যমূখীর মধ্যে সম্পর্কের যে জটিলতা তার জট উন্মোচন করার কাজে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে সুকুমার সেন তাঁর ' বাঙ্গালা সাহিত্যর ইতিহাস' নামক গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে বলেছেন ' বঙ্কিমের

কোন বিবাহিত নায়িকাই সন্তানবতী নয়। বাৎসল্যচিত্রের দুইটি টুকরোমাত্র পাওয়া যায়,- বিষবৃক্ষে কমলমণির পুত্র সতীশচন্দ্রের এবং আনন্দমঠে কল্যাণী মহেন্দ্রের কন্যার ছবিতে। কিন্তু দুইটিই নিতান্ত ক্ষণিক চিত্র।'[১৮] স্নেহ, বাৎসল্য , ত্যাগ প্রভৃতি গুণ যেগুলি মাতৃচরিত্রের মধ্যে সহজাত ভাবে থাক, সময়-পরিবেশ – পরিস্থিতি তে যা ফুটে ওঠে সামাজিক উন্যাসের মধ্যেও সেই মায়ের জায়গা হলো না।

'ইন্দিরা' য় দেখি ধনীবংশের আদুরে মেয়ে ইন্দিরা, বাপের বাড়ি থেকে শ্বশুর বাড়ি যাওয়ার সময় কালিদীঘির ডাকাতের হাতে পড়ে। এরপর কলকাতায় রাঁধুনির কাজ করে। রমণবাবু আর সুভাষিনীর মতো মনিব পেয়েছিল ইন্দিরা। প্রথমে ইন্দিরার মায়ের নামমাত্র উল্লেখ আছে। তারপর আর মায়ের মেয়ের জন্য কোন উদ্বেগ প্রকাশ পায়নি। ইন্দিরার বোন কামিনী , মায়ের থেকে তাকে কিছুটা সক্রিয় ভূমিকায় দেখি। এখানে মা মৃত নয়, থেকেও না থাকার মতোন তার অবস্থা।

'যুগলাঙ্গুরীয়' ক্ষুদ্রতম উপন্যাস। ধনদাসের কন্যা হিরণ্ময়ী, সে পুরন্দর নামক যুবকের সঙ্গে বাল্য প্রণয়ে জড়িত। তাদের বিয়ের সম্বন্ধ ও উভয়ের পরিবার থেকেই করা। হঠাৎ ধনদাস মেয়ের ভবিষ্যত সম্পর্কে আগাম জানতে পেরে সম্বন্ধ ভেঙে দেয়। এই নিয়েই ঘটনা এগিয়ে যায়। শেষে মিলনের মধ্য দিয়ে সমাপ্তি। পূর্বের মতো এই কাহিনিতেও মা কাঠের পুতুল। সে আছে, কিন্তু কোন ভূমিকা তার নেই। বাবা চিন্তিত, তিনি বিয়ে ভাঙছেন । মেয়েকে নিয়ে মায়ের উদ্বেগের কোন প্রকাশ নেই। যেটা আরো আশ্চর্যের যখন ধনদাস মারা যায় তার স্ত্রী অনুমৃতা হয়েছে। চতুর্থ পরিচ্ছেদে পাই মেয়ে মা কে তার পা ধরে কাঁদছে যে সে যেন স্বামীর অনুমৃতা না হন, মায়ের তাতে ও কিছু মনে হয়না।

'ধনদাসের পত্নী অনুমৃতা হইলেন হিরন্ময়ীর আর কেহ ছিলনা, এজন্য হিরন্ময়ী মাতার চরণ ধারণ করিয়া অনেক রোদন করিয়া কহিলেন যে , তুমি মরিও না। কিন্তু শ্রেষ্ঠীপত্নী শুনিলেন না। তখন হিরন্ময়ী পৃথিবীতে একাকিনী হইলেন।'[১৯] মাতা তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিল ' বাছা তোমার কিসের ভাবনা? তোমার একজন স্বামী অবশ্য আছেন। নিয়মিত কাল অতীত হইলে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে ও হইতে পারে । না হয়, তুমিও নিতান্ত বালিকা নহে...।[২০] সন্তান চিরকাল মায়ের কাছে ছোট থাকেই,এখানে কিছু কঠোর হৃদয় মাকে আমরা দেখলাম।

'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে মীরকাশিমের ইংরেজের সংঘর্ষের পটভূমিতে পারিবারিক জীবনের সমস্যা প্রধান হয়ে উঠেছে। শৈবলিনীর মায়ের উল্লেখ প্রথমে একবার ছিল, তারপর ই শৈবলিনী বলেছে তার মা বাবা কেউ নেই। প্রতাপের মায়ের ও একবার উল্লেখ আছে ,পরে কোথাও নেই। চন্দ্রশেখর শৈবলিনীর স্বামী কিন্তু সে ভালোবাসে প্রতাপকে, যার সঙ্গে তার বাল্য প্রণয়ের সম্পর্ক ছিল। হৃদয়ের দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে শৈবলিনী। মা এখানেও কাহিনির মধ্যে অপ্রয়োজনীয় ই রয়ে গেছে।

'রজনী' বাংলা ভাষায় প্রথম মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণমূক উপন্যাসে রজনী জন্মান্ধ। রজনীর মায়ের কথা আছে। মা তাকে কোন সাহায্য করতে পারেনি। প্রথমত তার জীবনে সমস্যা তৈরি হয় কিছুটা মায়ের জন্যই। রামসদয় মিত্রের বাড়ী ফুলের মালা দিতে গেছিলো মা এর জ্বর হয়েছিল বলে। রামসদয়ের প্রথম পক্ষের ছেলে রজনীর চক্ষু পরীক্ষা করে । শচীন্দ্রের হাতের স্পর্শে রজনী তাকে ভালোবেসে ফেলে। এরপর অন্যত্র রজনীর বিয়ে স্থির হলে সে বিয়েতে আপত্তির কথা মাকে জানিয়েও কোন ফল হয়নি। মা সেই কথা বাবাকে বলে দেওয়ায় রজনী মার খেয়েছে। নিরুপায় হয়ে সে বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে গেছে। এরপরের কাহিনির সঙ্গে মা এর কোন যোগ নেই। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায় রবীন্দ্রনাথের সুভা র কথা, যদিও সে নিজেকে রক্ষা

করতে অসমর্থ হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র রজনী চরিত্র টির প্রতি সুবিচার করেছেন, নিজের প্রতিবন্ধকতার কাছে সে হার মানেনি। সে চলে গেছে বাড়ি ছেড়ে, অনেক বছর পর ও সুভা যা পারেনি।

' রাধারানী' উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদেই রাধারানী দশ এগারো বছরের বালিকা তার মা ঘোরতর অসুস্থ সেটা আমরা জানতে পারি। রাধারানী বড়ো ঘরের মেয়ে, জ্ঞাতিরা তাদের সম্পত্তি আত্মসাৎ করে নেওয়ার জন্য তারা দরিদ্র হয়ে পড়েছে। মা সব গহনা বিক্রি করে মামলা করেছেন। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদেই মা মারা যায়। তারপর রাধারানী র কামাখ্যা বাবুর অভিভাবকত্বে থাকা, রুক্মিনীকুমার কে খোঁজা, শেষে মিলনান্তক পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন লেখক। যদি ও অল্প উপস্থিতিতেও মায়ের চরিত্রকে সুন্দর ভাবে তুলে ধরেছন ঔপন্যাসিক। মা নিজের কায়িক পরিশ্রম করে সংসার চালাতো, কেসে হেরে গেলে নিজের অলঙ্কার বিক্রি করে মামলা করেছেন , কামাখ্যাবাবু রাধারানীর পিতার বন্ধু মৃত্যুর আগে তার কাছে অনুরোধ করেছেন

"আমি চলিলাম,কিন্তু রাধারানী রহিল। এক্ষণে আদালত হইতে আমার শ্বশুরের যথার্থ উইল সিদ্ধ হইয়াছে, অতএব রাধারানী একা সমস্ত সম্পত্তির অধিকারিণী হইবে। আপনি তাহাকে দেখিবেন, আপনার কন্যার ন্যায় তাহাকে রক্ষা করিবেন, এই আমার ভিক্ষা। আপনি এই কথা স্বীকার করিলেই আমি সুখে মরিতে পারি।"[২১]

এই উদ্ধৃতি থেকে বুঝতে পারি রাধারানীর মায়ের ভুমিকা অল্প হলেও তার চিন্তা, দায়িত্ত্ব একজন স্নেহশীল মায়ের মতোন ই। বঙ্কিমচন্দ্র রাধারানীকে কাহিনির কেন্দ্রবিন্দুতে স্থান দিতে চেয়েছিলেন তাই নানা রকম সমস্যা, মাতৃবিয়োগ এসব প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে রাধারানীর জীবন সাজিয়েছেন, মাকে কাহিনি থেকে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বিদায় নিতে হয়েছে।

' কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসে উইল ই একটা চরিত্র হয়ে চরিত্র ও ঘটনাকে অনেকাংশে নিয়ন্ত্রন করেছে। । গোবিনলাল- ভ্রমর- রোহনীর জীবনের দ্বন্দ ই মূল বিষয় হয়ে উঠেছে। প্রথম খন্ডের ত্রিংশ পরিচ্ছেদ শুরু হয়েছে ঔপন্যাসিকের বয়ানে দিয়ে ,

" আমার এমন বিশ্বাস আছে যে , গোবিন্দলালের মাতা যদি পাকা গৃহিণী হইতেন, তবে ফুৎকার মাত্রে এ কালো মেঘ উড়িয়া যাইত। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে , বধূর সঙ্গে তাঁহার পুত্রের আন্তরিক বিচ্ছেদ হইয়াছে। স্ত্রী লোক ইহা সহজেই বুঝিতে পারে তিনি যদি এই সময় সদুপদেশে, স্নেহবাক্যে এবং স্ত্রীবুদ্ধিসুভ অন্যান্য সদুপায়ে তাহার প্রতিকার করিতে যত্ন করিতেন , তাহা হইলে বুঝি সুফল ফলাইতে পারিতেন; কিন্তু গোবিন্দলালের মাতা বড় পাকা গৃহিণী নহেন "[২২]

ঔপন্যাসিক পূর্ববর্তী উপন্যাসের তুলনায় এখানে কিছুটা এগিয়ে। তিনি অনুভব করেছিলেন মায়ের কোন ভূমিকা থাকা প্রয়োজন ছিল, কিন্তু কাহিনির প্রয়োজনে মা কে নিষ্ক্রিয় ই রাখতে হয়েছে।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদে ভ্রমরকে যখন স্বামী ত্যাগ করে গেল সে তার পুত্রের জন্য কষ্ট পেয়েছে, সূতিকাগারেই যে মারা গেছে ।ভ্রমর বলেছে

" আমার ননীর পুত্তলী,আমার কাঙ্গালের সোণা ,আজ তুমি কোথায়? আজ তুই থাকিলে কার সাধ্য আমায় ত্যাগ করে? আমার মায়া কাটাইলেন, তোর মায়া কে কাটাইত? আমি কুরূপা কুৎসিতা, তোকে কে কুৎসিত বলিত? তোর চেয়ে কে সুন্দর? একবার দেখা দে বাপ – এই বিপদের সময় একবার কি দেখা দিতে পারিস না? মরিলে কি আর দেখা দেয় না "[২৩]

মায়ের কাছে সন্তানের গুরুত্ত্ব ভ্রমরের এই আর্তিতেই বোঝা যায়। এখানে ভ্রমরের মাতৃত্বের ক্ষণিক আভাস আমরা দেখলাম। মায়ের চেনা স্নেহের ডাক বাছা, সোনা, ননীর পুতুল প্রভৃতি শুনে আমাদের মন ভরে যায়। ভ্রমরের বিপন্নতা বোঝাতেই এই অংশ টুকুর অবতারনা, যা যথোপযুক্ত হয়েছে। তবু ও এখানে ভ্রমরের স্বার্থ আছে , গোবিন্দলাল তাকে ছেড়ে যাচ্ছে বলেই সে সন্তানকে মনে করেছে। নিঃস্বার্থ মাতৃত্ব এখানে ও পাইনা।

" রাজসিংহ " উপন্যাসে চতুর্থ খন্ডের" প্রথম পরিচ্ছেদ ' চঞ্চলের বিদায়' নামক অংশে মহাদেবের বন্দনা করে চঞ্চলকুমারী মাকে প্রণাম করে কাঁদতে লাগলো। মায়ের কোন প্রতিক্রিয়া আমরা দেখলাম না এখানেও।

" আনন্দমঠ" উপন্যাসে কাহিনির শুরুতে মহেন্দ্র –কল্যাণীর একটা কন্যা সন্তান ছিল, প্রথম দু এক অধ্যায় ছাড়া তাকে ঘিরে কল্যাণীর মাতৃত্ব সেভাবে ফুটে উঠতে দেখিনা। 'দেবীচৌধুরানী' উপন্যাসে প্রথম খন্ডের প্রথম পরিচ্ছেদ শুরু হয়েছে মায়ের সঙ্গে প্রফুল্লর কথোপকথনের মধ্য দিয়েই। তারপর আর বিশেষ ভাবে দেখা যায়না। যদি ও মায়ের চিন্তা ছিল প্রফুল্ল র জন্য তাই বলেছে

'আমি মরিলে যা হয় করিস; তুই উপ্‌স করিয়া মরিবি, আমি চক্ষে দেখিতে পারিব না । যেমন করিয়া পারি , ভিক্ষা করিয়া তোকে খাওয়াইব।'[২৪] কিন্তু কাহিনীর শুরু শেষ এরকম চরিত কোন উপন্যাসেই বঙ্কিমচন্দ্র রাখেননি। অঙ্কুরেই ফুটে ওঠার সম্ভবনাকে সব ক্ষেত্রেই শেষ করা হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্র ভারতীয় সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক। কাহিনি গ্রন্থনে, জীবননাট্যের উপস্থাপনায়, ঐতিহাসিক ঘটনার সমাবেশে , হৃদয় বৃত্তির ঘাতপ্রতিঘাতে এবং দার্শনিক গভীরতায় তাঁর উপন্যাস আজও পাঠকের আনন্দ এবং সমালোচকের সমালোচনার নানা রসদ জোগায়। বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে বাংলা সাহিত্যে যথার্থ উপন্যাসের সূত্রপাত হলেও তারপর সেই পথ ধরে অনেকেই খ্যাতির চূড়ায় আরোহন করেছিল। রবীন্দ্রনাথ- শরৎ- বিভূতিভূষণ- তারাশঙ্কর- মানিক প্রভৃতি স্রষ্টার রচনায় উঠে এসেছে নানাবিধ বিষয়, তাও মাতৃ চরিত্র সেখানে উপেক্ষিত নয়। রবীন্দ্রনাথের অন্যতম উল্লেখযোগ্য উপন্যাস ' গোরা' তে আনন্দয়ী র মতো মাতৃচরিত্র যিনি নিজের সন্তান শুধু নয় , গোরা যে আইরিশ তাকেও শিশু অবস্থা থেকে লালন পালন করেছেন। 'চোখের বালি' তে মহেন্দ্রর মা রাজলক্ষ্মী পুত্র আর পুত্রবধূর সংসারে সুন্দরী বিনোদিনীকে এনে তাদের সম্পর্ক কে বিষিয়ে দিয়েছে, আবার তিনি পরে নিজের ভুল বুঝতে পেরে দুজনকে মিলিয়েও দিয়েছেন। ছেলে আমার , আর তার ওপর অধিকার শুধু মায়ের ই এই ভ্রান্ত ধারণা সেখানে ছিল। মহেন্দ্র নিজের পছন্দে আশাকে বিয়ে করেছে এটা মানতে পারেননি মহেন্দ্র র মা। আশা কে ছোট প্রতিপন্ন করতে প্রতিযোগিনী হিসাবে বিধবা সুন্দরী বিনোদিনীকে সংসারের মধ্যে স্থান দিয়েছে। উপন্যাসে গুরুত্ত্বপূর্ণ ভুমিকায় মাকে দেখেছি। শরৎ উপন্যাসে গর্ভ ধারিনী মায়ের কথা না থাকলে মাতৃস্নেহের সেখানে অভাব নেই। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে নারীদের মধ্যে প্রেমিক সত্বার থেকে ও নারীদের মধ্যে মাতৃত্ব সত্ত্বা ই বেশী ফুটে উঠেছে। 'রামের সুমতি', 'বিন্দুর ছেলে' এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হতে পারে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী' সর্বজয়ার মতো মাতৃচরিত্র দেখেছি। তারাশঙ্করের ' ধাত্রীদেবতা' য় শিবনাথের মায়ের চরিত্রে লেখকের ই মায়ের ছাপ পড়েছে, তারাশঙ্করের আত্মজীবনী পড়লে তা জানা যায়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি উপন্যাসের নাম ই ' জননী' , এছাড়া 'পদ্মানদীর মাঝি' তে মালাকে পেয়েছি, যে পঙ্গু হলে ও তার মধ্যে মাতৃত্ব আছে। বঙ্কিমচন্দ্র এই মা চরিত্র কে নিয়ে কাহিনীতে বেশিদূর এগোননি, এটা কি ব্যক্তিগত জীবনের জন্য। বঙ্কিমচন্দ্র, শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে বলেছিলেন

'একজনের প্রভাব আমার জীবনে বড় বেশি রকমের- আমার পরিবারের। আমার জীবনী লিখিতে হইলে তাহার ও লিখিতে হয় তিনি না থাকিলে আমি কি হইতাম বলিতে পারিনা। আমার যত ভ্রম প্রমাদ তিনি জানেন আর আমি জানি '

অন্যদিকে বঙ্কিমচন্দ্রের মা দূর্গাসুন্দরী দেবী, নাম টুকু ছাড়া অতিরিক্ত আর কিছুই তাঁর সম্পর্কে জানা যায়না। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর পিতার কর্ম স্থলে ছয় সাত বছর বয়সেই চলে আসেন লেখা পড়ার উদ্দ্যেশে, মায়ের কোন প্রভাবের কথা তার জীবনে ও পাওয়া যায়নি কোন তাঁর সম্পর্কে লিখিত গ্রন্থে। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনে তার পিতৃদেবের ও প্রভাব ছিল ,তাঁর অনুজ পূর্নচন্দ্র এভাবে বর্ননা করেছেন

'তখন কয় বৎসর পিতৃদেবের নিকটে থাকিয়া ধর্ম সম্বন্ধে শিক্ষা পাইতে লাগিলেন। .... কোন ও ধর্ম প্রচারকের নিকট তিনি হিন্দুধর্ম শিক্ষা পান নাই । তাঁহার এমাত্র ধর্মোপদেষ্টা ছিলেন আমাদের পিতৃদেব। ' দেবী চৌধুরানী' গ্রন্থখানি তাঁহাকে উৎসর্গ করিতে গিয়া লিখিয়াছেন ' যাঁহার কাছে নিষ্কাম ধর্ম শুনিয়াছি , যিনি স্বয়ং নিষ্কাম ধর্ম ব্রত করিয়াছিলেন।'

উপরোক্ত উদ্ধৃতি থেকে বঙ্কিমের জীবনে তার পিতা, পরিবারের (স্ত্রী র) প্রভাব ছিল সেটা তিনি নিজেই বলেছিলেন আর তাঁর সৃষ্ট আখ্যানে ও আমরা তা পেয়েছি। পিতৃচরিত্র রা গুরুত্ত্ব ও স্থান পেয়েছে (মাধবীনাথ, ধনদাস, শশিশেখর প্রভৃতি) । সূর্যমুখী, ভ্রমর (স্ত্রী চরিত্র) একমুখীনতায়, পতিপ্রেমে, ত্যাগের চূড়ান্ত পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের সামনে উপন্যাসের তেমন আদর্শ ছিলনা তাও কাহিনি গ্রন্থনে, চরিত্র সৃজনে, আখ্যনের গঠন কৌশলে, মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে বঙ্কিম প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। বাইরে পুরুষের স্থান, মেয়েরা ঘরের ভিতর থাকবে এরকম ভাবনা তাঁর ছিল তেমন বলা যাবেনা। প্রফুল্ল, নির্মল কুমারী, শৈবলিনী র মতো চরিত তিনি সৃষ্টি করেছিলেন। সব কিছু বিচার করে এই সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে যে তাঁর জীবনে মায়ের প্রভাব কম ছিল হয়তো বা। মাত্র এগারো বছর বয়সে তার বিয়ে হয়, একবছর পর স্ত্রী বিয়োগ হয়। ১৮৬০ সালে পুনরায় বিয়ে হয়। এর আগে ছয় সাত বছর বয়সে বাবার কর্মসূত্রে লেখা পড়ার জন্য চলে আসেন। তাঁর জীবনে মায়ের প্রভাব হয়তো তাই কিছু কম যা সাহিত্যে ও প্রতিলিত হয়েছে।

তথ্যসূত্র:

১) সেন সুকুমার , বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড, আনন্দ , প্রথম প্রকাশ ১৯৪০, পৃষ্ঠা১৭৮
২) চক্রবর্তী জাহ্নবী কুমার , বাংলা সাহিত্যে মা, দেজ পাবলিশিং,প্রথম প্রকাশ অগ্রহায়ণ ১৩৬৭, পৃষ্ঠা সংখ্যা২৯
৩) তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৯
৪) তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫২
৫) তদেব পৃষ্ঠা সংখ্যা, ৫৪
৬) তদেব পৃষ্ঠা সংখ্যা, ৫৮
৭)তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৭
৮)তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭৯
৯) ঠাকুর টেকচাঁদ , আলালের ঘরে দুলাল, পৃষ্ঠা ৯০
১০) তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা,৯০
১১) মুখোপাধ্যায় ভোলানাথ, প্রজ্ঞাভারতী, প্রথম সংস্করণ ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দ, পৃষ্ঠা ৮৯
১২)বঙ্কিম রচনাবলী, শুভম প্রকাশ, প্রথম প্রকাশ ১লা জানুয়ারী ২০০৯, পৃষ্ঠা ৫৯

১৩) তদেব পৃষ্ঠা সংখ্যা ১১৭
১৪)তদেব পৃষ্ঠা সংখ্যা১১৯
১৫)তদেব পৃষ্ঠা সংখ্যা২০৭
১৬)তদেব পৃষ্ঠা সংখ্যা২৩১
১৭)তদেব পৃষ্ঠা সংখ্যা২৩১
১৮)সেন সুকুমার , বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড, আনন্দ , প্রথম প্রকাশ ১৯৪০, পৃষ্ঠা১৮০
১৯) বঙ্কিম রচনাবলী, শুভম , প্রথম প্রকাশ ১লা জানুয়ারী ২০০৯,পৃষ্ঠা ৩৭৪
২০) তদেব পৃষ্ঠা সংখ্যা৩৭৪
২১)তদেব পৃষ্ঠা সংখ্যা৪৭৪
২২)তদেব পৃষ্ঠা সংখ্যা৫৮৬
২৩)তদেব পৃষ্ঠা সংখ্যা৫৮৯
২৪)তদেব পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮১৭

গ্রন্থপঞ্জি

আকর গ্রন্থ

- বঙ্কিম রচনাবলী , ১ম খণ্ড, দেজ পাবলিশিং , প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি,২০০৬
- মুখোপাধ্যায় ভোলানাথ, “ আপনার মুখ আপুনি দেখ ” প্রজ্ঞা ভারতী, প্রথম সংস্করণ ১৮৬৩ খ্রীঃ

সহায়ক গ্রন্থ

- ভট্টাচার্য অমিত্রসূদন , “বঙ্কিমচন্দ্র জীবনী” আনন্দ পাবলিশার্স ,১৯৯১
- ভট্টাচার্য অমিত্রসূদন , “বঙ্কিমচন্দ্র ও বঙ্গদর্শন” , জিজ্ঞাসা, আষাঢ় ১৩৬৬
- নাগ অরুণ সম্পাদিত ‘সটীক হুতোম প্যাঁচার নকশা’,আনন্দ , প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৩৯৮
- গুপ্ত ক্ষেত্র সম্পাদিত ‘বঙ্কিমচন্দ্রের রাজসিংহ’, প্রজ্ঞা বিকাশ,জুলাই ২০০৭
- সাহা জয়ন্তী, “ বঙ্কিম বীক্ষা” , সংবাদ ১ম প্রকাশ মহালয়া, ২৪ শে সেপ্টেম্বর ১৯৬০
- রায় দেবেশ , “উপন্যাস নিয়ে” দেজ পাবলিশিং , প্রথম প্রকাশ বইমেলা জানুয়ারী
- সান্যাল নলিনীমোহন, “বঙ্কিম প্রতিভা”, বাঙ্গালী বুক ডিপো, ১লা শ্রাবণ, ১৩৪৬
- বসু রামদুলাল ,” বঙ্কিম চন্দ্রের সমকালীন গৌণ ঔপন্যাসিক বৃন্দ, চলন্তিকা, প্রথম প্রকাশ ৫ ই এপ্রিল ১৯৫৪রি ১৯৯১
- দাশগুপ্ত শশীভূষণ , “ বঙ্কিমচন্দ্র ও সাহিত্যের আদর্শবাদ” প্রবাসী ১৩৪৫ বৈশাখ সংখ্যা
- সেনগুপ্ত সুবোধচন্দ্র ‘বঙ্কিমচন্দ্র’ কালীঘাট , কলকাতা ১৩৪৫
- সেন সুকুমার , “ বাঙ্গালা সাহিত্যে ইতিহাস ” তৃতীয় খন্ড ,আনন্দ , সপ্তম সংস্করন ১৩৮৫
- দাশগুপ্ত রাহুল , “বাংলা উপন্যাস কোশ”, প্রতিভাস প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৭ বইমেলা।
- ভট্টাচার্য সুকুমারী , “প্রাচীন ভারতঃ সমাজ” ,গাংচিল প্রকাশনী।